জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন

আবুল হাসান
(১৯৪৭–১৯৭৫)

মৃত্যু আমাকে নেবে, জাতিসংঘ আমাকে নেবে না,
আমি তাই নিরপেক্ষ মানুষের কাছে,
কবিদের সুধী সমাবেশে
আমার মৃত্যুর আগে বোলে যেতে চাই,
সুধীবৃন্দ ক্ষান্ত হোন, গোলাপ ফুলের মতো শান্ত হোন
কী লাভ যুদ্ধ করে, শত্রুতায় কী লাভ বলুন?
আধিপত্যে এত লোভ? পত্রিকা তো কেবলি আপনাদের
ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংস আর বিনাশের সংবাদে ভরপুর...

মানুষ চাঁদে গেল, আমি ভালবাসা পেলুম
পৃথিবীতে তবু হানাহানি থামলো না!
পৃথিবীতে তবু আমার মতন কেউ রাত জেগে
নুলো ভিখিরির গান, দারিদ্র্যের এত অভিমান দেখল না!

আমাদের জীবনের অর্ধেক সময় তো আমরা
সঙ্গমে আর সন্তান উৎপাদনে শেষ করে দিলাম
সুধীবৃন্দ, তবু জীবনে কয়বার বলুন তো
আমরা আমাদের কাছে চলতে পেরেছি
ভালো আছি, খুব ভালো আছি?

হ্যামলেট

অচ্যুত মণ্ডল
(১৯৬৮–২০০৯)

রাজ্য নেই ওফেলিয়া, যুবরাজ নই, তবু বুঝি
পৃথিবী নামের দেশে কোথাও গভীর ভুল আছে।
থাকা আর না থাকার মধ্যবর্তী ক্লান্ত গলিঘুঁজি
হাঁটি উত্তরের খোঁজে শহরের আনাচে কানাচে।

পিতার প্রেতাত্মা যেন কলেজের কোণে অধ্যাপক
অক্ষম জ্ঞানের ভারে। বিবেচক বন্ধু হোরেশিও
ছবি আঁকে, গান গায়, কবিতার মরমী পাঠক;
তৃপ্তির ঢেকুরে শোনে ছায়াছবি গানের রেডিও।

মফস্বলী মহিলার ফর্সা হাঁটু দ্যাওরের কোলে,
সকলেরই চোখেমুখে অনাবিল আনন্দের রেশ;
যেন কারো কষ্ট নেই, ভালো রান্না— ঝোলে বা অম্বলে
নুন আছে কি না কেউ কোনোদিন করেনি জিজ্ঞেস!

আত্মবিলোপের মতো অন্ত্যমিলে যে লেখে সনেট
অমাত্য বা ভাঁড় নয়— কালান্তরে ক্লিষ্ট হ্যামলেট।

মধ্যরাত্রির অভিমান

অমিতেশ মাইতি
(১৯৬২–২০০১)

পাশের ফ্ল্যাটে হাউহাউ কাঁদতে কাঁদতে একটা লোক জানতে চাইছে
বলো কী ঘটেছিল বারো ডিসেম্বর রাতে?
কী হয়েছিল? কেন ওরকম করছিলে?
অথচ এখন কোনো প্রশ্নমুখর অবকাশ নেই কোথাও।
এখন নিজের ঘরে কেন, নিজেকেও প্রশ্ন করা বাচালতা।
উদ্যত খাঁড়ার মতো সহস্র প্রশ্নচিহ্ন, ঘুরন্ত ফ্যানের ব্লেডে সাঁইসাঁই শব্দ
নাকি কাছেই কোনো সমুদ্র আছে কিংবা সাপের গর্ত!
বারো ডিসেম্বর রাতে কী হয়েছিল?

হয়তো মেয়ে সেদিন বাবার মাতাল বন্ধুর সঙ্গে অনেক রাতে ফিরেছিল
হয়তো ছেলে রেসকোর্সে খঞ্জ ঘোড়ার পিঠে জীবনকে বাজিয়ে দেখেছে
হয়তো বউটি স্বামীকে চুম্বনের সময় ঠোঁটে অন্য নারীর স্পর্শ পেয়েছে
হয়তো লোকটা নিজেই...

কথা হল, কোথায় কখন কিভাবে ঘটবে
ঘটনা যখন তা নিজেও জানে না
বালিশে কার হাসির শব্দ, কার গোপন কথায় তুলো ভারি হয়ে আছে—
যা ঘটে তা কি শুধু রাত্রেই ঘটে?

এখন স্বভাববশত আগুন প্রবেশ করে, কথা বলে সূক্ষ্ম ভাষায়
ও ঘাস ও ফুল ও পাখি ও পাতা তোমরাও ডাকো
লোকটিকে জিজ্ঞেস করো— এতসব ছেড়ে ও কোথায় যাচ্ছে।

কথা ছিল সুবিনয়

রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(১৯৫৬–১৯৯১)

কথা ছিলো রক্ত প্লাবনের পর মুক্ত হবে শস্যক্ষেত
রাখালেরা পুনর্বার বাঁশিতে আঙুল রেখে
রাখালিয়া বাজাবে বিশদ
কথা ছিলো বৃক্ষের সমাজে কেউ
কাঠের বিপনি খুলে বসবে না,
চিত্রল তরুণ হরিণেরা সহসাই হয়ে উঠবে না
রপ্তানিযোগ্য চামড়ার প্যাকেট।

কথা ছিলো, শিশু হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদের নাম
নদীর চুলের রেখা ধরে হেঁটে হেঁটে
যাবে এক মগ্ন ভগীরথ,
কথা ছিলো, কথা ছিলো আঙুর ছোঁবো না কোনোদিন
অথচ দ্রাক্ষার রসে নিমজ্জিত আজ
দেখি আরশিমহল,
রাখালের হাত দুটি বড় বেশি শীর্ণ আর ক্ষীণ
বাঁশি কেনা জানি তার কখনোই হয়ে উঠে নাই

কথা ছিলো, চিল-ডাকা নদীর কিনারে
একদিন ফিরে যাবো।

একদিন বট বিরিক্ষির ছায়ার নিচে
জড়ো হবে
সহজিয়া বাউলেরা,
তাদের মায়াবী আঙুলের টোকা ঢেউ তুলবে একতারায়
একদিন সুবিনয় এসে জড়িয়ে ধরে
বলবে : উদ্ধার পেয়েছি।

কথা ছিলো, ভাষার কসম খেয়ে
আমরা দাঁড়াবো ঘিরে
আমাদের মাতৃভূমি, জল, অরণ্য, জমিন
আমাদের পাহাড় ও সমুদ্রের আদিগন্ত উপকূল
আজন্ম এ জলাভূমি খুঁজে পাবে
প্রকৃত সীমানা তার।

কথা ছিলো, আর্য বা মোঘল নয়, এ
জমিন অনার্যের হবে।
অথচ এখনো আদিবাসী পিতাদের
শৃঙ্খলিত জীবনের ধারাবাহিকতা
কৃষকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুনে যায় বন্দিত্বের বীজ
মাতৃভূমি-খণ্ডিত দেহের পরে তার
থাবা বসিয়েছে
আর্য বণিকের হাত

কথা ছিলো, 'আমাদের ধর্ম হবে
ফসলের সুষম বন্টন,'
আমাদের তীর্থ হবে শস্যপূর্ণ
ফসলের মাঠ।
অথচ পাণ্ডুর নগরের অপচ্ছায়া
ক্রমশ বাড়ায় বাহু
অমলিন সবুজের দিকে, তরুদের সংসারের দিকে
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় আমাদের
ধর্ম আর তীর্থভূমি,
আমাদের বেঁচে থাকা, ক্লান্তিকর
আমাদের দৈনন্দিন দিন।